কথক

বিশেষ সংখ্যা ২০২০

কথক

বর্ষ ১৩ * সংখ্যা ১
অক্টোবর ২০২০

ISSN 2394-8515
RNI NO. WBBEN/2008/24334

সম্পাদক
শতদল মিত্র

Printed and Published by Satadal Mitra on behalf of owner Satadal Mitra, Printed at Mudrak, 143, R.N. Tagore Road, Thakurpukur, Kolkata-700 063, Dist. 24 Pgs.(South), Published at 143, R.N. Tagore Road, Thakurpukur, Kolkata-700 063, Dist. 24 Pgs.(South). Editor : Satadal Mitra
Phone : 8017872491 * Mail : satadalkathak@gmail.com

সূচি

প্রবন্ধ

পীযূষ ভট্টাচার্যর গল্পগ্রন্থ : কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের পিঠে শতানীক রায় ৭
অপ্রথাগত সবুজপত্র ফাল্গুনী ঘোষ ২১
কবিতা বনাম কবিতা বিমল মৈত্র ৩১

গল্প

ও মেঘমালা! গুলাবদাস ব্রোকার ৫০
ঝুমঝুমির কথা মধুময় পাল ৬৬
বুড়ো সমীরণ দাস ৭৪
উকুনশ্রী তৃষ্ণা বসাক ৮৩
জোনাকির জীবন অসিত কর্মকার ৯১
গন্ধ নন্দিতা আচার্য্য ১০০
অস্ত্র ও রক্ত শান্তনু ভট্টাচার্য ১০৭
মাত্র দু-গজি শতদল মিত্র ১১৩

কবিতা-১

সব্যসাচী দেব গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রতী মুখোপাধ্যায় সৌম্য চট্টোপাধ্যায় দুর্গাদাস মিদ্যা অমিত কাশ্যপ ফটিক চৌধুরী সুধাংশুরঞ্জন সাহা অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯-৪৮

কবিতা-২

রাহুল পুরকায়স্থ সুদীপ্ত বিশ্বাস পিনাকী রায় ভগবাহাদুর সিং বিশ্বজিৎ রায় দেবকুমার দে মৃন্ময় চক্রবর্তী প্রদীপ ঘোষ শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায় আম্রপালী দে রিমি মুৎসুদ্দি ঝুমা মজুমদার চৌধুরী হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সেলিম মণ্ডল সোমনাথ বেনিয়া চন্দ্রলেখা মহান্তী সুবিৎ ব্যানার্জী সৌরভ আহমেদ সাকিব প্রবীর মজুমদার রাজীব মৌলিক প্রিয়াঞ্জলি দেবনাথ ডালিয়া বসু সাহা শর্মিষ্টা দে ১২৩-১৪৫

প্রচ্ছদ : দেবাশিস সাহা

সম্পাদকীয়

দুঃসহ সময়, যা সভ্যতার সংকটই। বিশ্বজোড়া অতিমারি, প্রাণহানি। অতিমারি, তাই বিশ্বজোড়া অতিমন্দা (অবশ্য আমাদের রামরাজ্যে নোটবন্দি, অসম্পূর্ণ জিএসটি-এর কারণে তার আগে থেকেই ঘোর মন্দা)। কোটি-কোটি লোকের জীবিকা নষ্ট। বিশ্ববাসী আমরা কেউই ভালো নেই। তবুও তো জীবন! তাই-ই উৎসব। এ জীবন-উৎসবে সামিল 'কথক'ও, তার সাধ্যমতো। অতিমারি কারণে মুদ্রিতরূপ সাধ্যে কুলিয়ে উঠল না, ফলে 'কথক'-এর এই পিডিএফ-রূপ। আশা করি লেখক ও পাঠকরা আগের মতোই 'কথক'কে ভালোবাসা দেবেন। সকলে সাবধানে থাকুন, ভালো থাকুন—এইটুকুই কামনা।

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ

পীযূষ ভট্টাচার্যর গল্পগ্রন্থ: কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের পিঠে

শতানীক রায়

রোগা হতে চাওয়া। না কি শরীরে মেদ বাড়ানোর চেষ্টা। মানসিকভাবে সমৃদ্ধ হলে শরীরও সমৃদ্ধ হয়। এটা উপলব্ধি করেছি। শারীরিক অনেকটা। আমাদের সাহিত্যপাঠও শরীরের মতো। শরীর বহন করে আজীবন চলতে হবে। কোথাও কোনো শূন্যতা তো আছেই। তার ভেতরে গোপন কুঠুরিতে আমি। কোন অনন্তের দিকে সিঁড়ি তৈরি করা। 'এই ছ-মাসে ছাব্বিশটা রবিবার নমিতাকে বিশেষভাবে লক্ষ করে বুঝেছি— ও হাঁটা চলা করছে এমনভাবে যেন বাড়িটাই জনশূন্য। এ কি আমার উপস্থিতিকে অস্বীকার করবার জন্য? অন্যান্য দিন তো বাড়িতেই থাকি না— এখনও কি এ ভাবে নিজের মনে হাত দোলাতে দোলাতে এঘর থেকে ওঘরে হেঁটে বেড়ায়। খুউব ছোট বেলায় হাত দোলাতে দোলাতে হেঁটে বেড়ানো ভূতের কথা রাত্রিতে বলা হত আমাকে চুপ করানোর জন্য। ভয়ে জড়সড়ো হয়ে চোখের পলক না ফেলে লক্ষ করতাম কখন বড়োরা হাত দোলাতে শুরু করে দেবে ভূতের মতন— তারা যে বিষয়ে কথা বলছেন তা ছোটোদের শুনতে নেই অথচ শুনতাম আর ভয়ে ভুলেও যেতাম।' এরকমই

শরীর-মনের চর্চার মধ্যে দিয়ে পীযূষ ভট্টাচার্যর কথাসাহিত্যের পঠন করতে হয়। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাঁর 'কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের পিঠে' গল্পগ্রন্থের চর্চা।

পৃথিবীতে অনেক অনেক বছর পথ চলার যে-শান্ত অনুভূতি সঞ্চিত করে চলেছে মানুষ যার ফলাফল হিসেবে মানুষ নিজেই স্বয়ং তার ফসল। ক্ষয়, প্রতিহিংসা, ব্যথা, ভালোবাসা, প্রতারণা, রাগ-পূর্বরাগের যত সব ঘটনা তার সবই উপকথার ভেতর গচ্ছিত থাকে। যেখানে উপকথা স্বয়ং মানুষের গতিপ্রকৃতি তার নিয়তি এবং অদ্ভুত ফলনশক্তি যার অধিকাংশই শান্তিদায়ী— আদানপ্রদানে ক্ষয়ীষ্ণু। শান্তি বিঘ্নিতকারীও ওই একই উপকথা। ঘষা খেতে খেতে পিঠ ছলে যাওয়ার অমোঘ নিয়তিকে কে নিয়ন্ত্রণ করে— কলির দেবতার বাহন সেই কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়টি? না কি তার পিঠে অধিষ্ঠাতা দেবতা যাঁকে মানুষই উপকথার আদল দিয়ে ধূপচন্দন দিয়ে দয়াদাক্ষিণ্য দিয়ে কলির দেবতা করে তুলেছে। সঙ্গে মনে রাখতে হবে মানুষের জীবনে যতরকম বঞ্চনা আছে বা সম্ভাবনা থাকতে পারে যা একত্রিত করলে যে-প্রবল ধুলোঝড়ের আশঙ্কা দেখা দেয় সে-সব নিয়েই আমাদের পূর্ণাঙ্গ কারবার চলে দিনরাত অনর্গল চন্দ্রসূর্যের পৃথিবীতে। কে জানে কখন কী ঘটে যাবে যাকে প্রলয় বলে চিহ্নিত করে ফেলবে মানুষরূপী কিছু দেবতা।

'কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের পিঠে' গল্পটা নিয়েই পাতার পর পাতা লেখা যায় যেখানে বঞ্চনা ভরপুরভাবে ঠেঁসে তোলা আছে। যা সময়ে সময়ে অন্তর্গত কোনো বিপুল চেতনায় আরও বেশি প্রাচীন হতে হতে ক্ষুধিত ষাঁড়ের বেশ নিতে পারে। যার ফলস্বরূপ এখানে হয়তো দুটো ষাঁড়ের লড়াই। যেখানে কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়টিকে রীতিমতো বিজেতা ঘোষণা করে পরাজিতের রক্তমাখা অবস্থায় রূপকথা মাখানো উপকথার সুরে গড়ে তোলা হয়েছে। যাকে মানুষেরা বিজয়ী বলে আখ্যায়িত করলেও অন্তরায় হয়ে উঠেছে প্রবল ব্যথা মেশানো ভয়। শান্তি বিঘ্নিত হয়ে যেখানে গাভীগুলো বিক্ষত করে হত্যা করেছে একজন গোয়ালাকে। এখানে মানুষদের গোয়ালার মৃত্যুর প্রতি আগ্রহের চেয়ে ভয় ভক্তি আগ্রহ উচ্ছ্বাস উৎসবে পরিণতি পেয়েছে। রূপকথার আদলটা নিয়ে না হয় পরে বলছি। পাশাপাশি এতগুলো গিঁট পাকানো কাহিনি। যক্ষারোগীভরতি একটি বাড়ি যার বাতাসই অনেকটা আক্রান্ত সন্ত্রাসের নমুনা পেশ করে। একজন স্বাভাবিক কৌতূহলী ছেলে সেখানে থাকে তার যক্ষা

আক্রান্ত মায়ের সঙ্গে। বাবা ছেড়ে গেছে আর ফিরে তাকায়নি পরিবারের দিকে, বিধবা শালির সঙ্গে সংসার পেতেছে। রাতারাতি সংসার শুরুর দিন বিধবা শালির চুল লম্বা হয়ে উঠেছিল এও কি রূপকথার গাঢ়তর অবস্থার চেয়ে কম কিছু! যক্ষা রুগীর কাশি আর তার থেকে পলায়ন করার পথ হিসেবে রাতের ইউক্যালিপটাস গাছে ঝুলে ফাঁসি দেওয়ার প্রবল ইচ্ছে এখানে আমার কচুগাছে ফাঁসি দেওয়ার মতো মনে হয়েছে। বা প্রবল কাশির দাবদাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে-গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবার প্রতীকও আমার মনে হয় গ্রিকদের ব্যথা অতিক্রম করার কোনো মনোরঞ্জন প্রদায়ক পন্থার সমতুল্য। সেখানে ছেলেটির মধ্যে প্রবল সন্ত্রাস যে কাজ করেনি তা নয় সেটা যখন পাঁচিলের উপর উঠে ষাঁড়ের লড়াই দেখা কিংবা কাহিনি বিবরণের আধিভৌতিকতার ভেতর প্রকাশ পেয়েছে এও কি কম দক্ষ কোনো প্রকাশ। পীযূষ ভট্টাচার্যর কথাসাহিত্যকে অনেকেই নানাভাবে কঠিন দুর্বোধ্য ঠাওরানো চেষ্টা করে থাকেন। তাঁদের শুধু বলব জীবনকে সময় দিয়ে গভীর নির্লিপ্ত চলনকে বোঝার দেখার অবসরটুকু দিতে। বোঝা-না-বোঝা সে তো পরের কথা, কে কীভাবে ন্যারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাজনীতিকে অনুধাবন করবেন সেটা ব্যক্তিগত ডিসকোর্স।

প্রবল যে-বৃষ্টির কথা বলেছেন লেখক (গল্পের কথকের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন) তার অনুষঙ্গও অনেকটা প্রাচীন। মানুষের পাপ ধুয়ে দেওয়া বৃষ্টিকে বোঝাতে পারে। মিথিকাল। প্রাচীন খরস্রোতা নদী যে এখন নেই সেটাও সরস্বতী নদীর উল্লেখ হতে পারে। আসলে ঋগ্বেদের সেই সরস্বতী নদীকে আমার বারবার মনে হয় জ্ঞানের প্রতীক। যা পরবর্তীকালে নদী থেকে দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এও একধরনের উপকথার অন্তরালে, পৌরাণিকতার আড়ালে কাহিনিকে মানবিক করে তোলা যার থেকে এক শান্তিদায়ী কিছু উঠে আসবে হয়তো। এটাই ভারতীয় সভ্যতার নিয়তি। বিস্ময়ও কি কম এখানে। এখানে কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়টির পিঠ থেকে নামার পরও গল্পের কথক বলছেন, তিনি নামতে পারেননি। অবসর খুঁজেছে সে। 'তাই, কৃষ্ণবর্ণের ষাঁড় ও আমাকে অপেক্ষা করতে হয় এমন এক বিস্মৃতির যা দু'জনকেই মুক্তি দিতে পারে। এক এক সময় মনে হয় শুধুমাত্র আমাদের জন্য এই বিস্মৃতি অপেক্ষা করছে না, সকলের জন্যই করছে আর সব কিছুই নির্ভর করে আছে

সময়ের অপেক্ষায়।'

পীযূষ ভট্টাচার্যের গল্পের একটা বিশেষ গুণ হল, একটা মূল বিষয় থাকে কেন্দ্রে যেটাকে ঘিরে আরও অনেক পুরোপুরি ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি গড়ে ওঠে যা মূল দর্শনকে আরও বেশি বহুরৈখিক করে তোলে। কখনো উলটোটাও ঘটে শাখাপ্রশাখা হিসেবে গল্পের শুরুতে একটি মিথ থাকে যাকে কেন্দ্র করে কাহিনি গড়ে ওঠে। কাহিনি চলতে থাকে সেই মিথকে ধীরে ধীরে লৌকিক করার তাগিদে। এটা গল্পকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আর যেটা বিশেষ দিক: অযথা কোনো আবেগের ছড়াছড়ি নেই। প্রথাগত ডায়ালেক্টের ব্যবহার খুবই কম। বর্ণনাও মেধাবী। যদিও আমার কথাটি মোটেও স্পেসিফিক নয় এর অনেক সূক্ষ্মতা প্রয়োজন। যেমন এই গল্পটির ঐতিহাসিক বাস্তবতা আছে, মোহেনজোদারোর ষাঁড়ের যে-দেয়ালচিত্রটি দিয়ে শুরু হচ্ছে গল্প তার প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। এখানে সেই ঐতিহ্যকে গল্পকার নিজের মতো করে কাল্পনিক করেছেন আর এই কল্পনাকে ঘিরে গল্প। গল্পে সেটা লৌকিকতা পেলেও ইতিহাসগত ও কল্পনাজাত মহিমা একটি মুহূর্তের জন্যও খণ্ডিত হয়নি। বিধবাদের চুল ছোটো রাখার প্রচলনও সামাজিক ইতিহাসের একটা অঙ্গ ছিল একসময়। গল্পে বিধবার দাম্পত্যে ফেরার পর 'রাতারাতি চুল বড়ো হওয়া'-র মধ্যে প্রতীকী গুরুত্ব থাকলেও পাশাপাশি অনেক বেশি জাদুবাস্তবতা বহন করে। ইতিহাসকে যে এভাবেও দেখানো সম্ভব এটা এক নতুন দিক। এটাকে আমি মেধানিয়ন্ত্রিত আবেগ হিসেবে আখ্যায়িত করব।

২

একজন মানুষ যে আছে এই নিখুঁত কিংবা খুঁতসম্পন্ন অবস্থা টের পাবার জন্য কখনো কখনো না-থাকার ভেতর দিয়ে বুঝে নিতে হয়, সেই মানুষটি আছে কি না। সরল হিসেব নেই। কোনো জটিল অঙ্কের মতোও নয় এটা। এর গভীর গোপন প্রান্তে গাঢ় অন্ধকার মিশে আছে। তার অস্তিত্বের সবটুকু, তার জমাটবদ্ধ অন্ধকারকে অনুভব করে নিতে হবে কোনোরকম ধৈর্য না হারিয়ে। এখানে কোনো সুবিধাজনক অবস্থান নেই, থাকার সম্ভাবনাও নেই। অস্তিত্বের কোন অবস্থানে থেকে একজন গল্পকার তাঁর নিজের বৃত্তের অন্ধকারকে নির্ভর

করে 'সোমবার'-এর মতো গল্প লেখেন। বলতে পারি, কীরকম অবস্থা থেকে নিজের অন্বেষণ আর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার অন্ধকার তৃষ্ণা থেকে তিনি 'সোমবার' গল্পটি লেখেন। আমার আগের দু-টি বাক্যের গূঢ়ার্থে প্রশ্ন লুকিয়ে থাকলেও সেগুলো ঠিক প্রশ্ন হয়ে ওঠে না, সেটা কেন ঘটছে তারও তীব্র একটা কারণ অন্তর্নিহিত আছে। পাঠক হিসেবে আমার একরকমের অন্ধকারের প্রতি তৃষ্ণা আছে সেটি যখন অদ্ভুতভাবে গল্পটির অন্ধকারে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে সেখানে গল্পস্রষ্টার অন্ধকার মিশে থাকলেও যেহেতু গল্পের চরিত্রটি সর্বজনীনতা বহন করে চলেছে সেখানে এসে অন্তর্ঘাতে হারিয়ে যাওয়া কোনো কঠিন ব্যাপার না। আর এই স্বাভাবিকতাকেই বহন করা হয়েছে এই গল্পে।

খুব কমই ঘটে এরকম যখন মুহূর্ত তৈরি হয় আর আমরা অনুভব করতে পারি আমাদের রক্তমাংস। আমাদের রক্তমাংসের এইসব কথাগুলো বহুল আলোচিত। 'রক্তমাংস' শব্দটি যে নিছকই কোনো শব্দ নয় তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। গভীর কোথাও কোনোখানে গচ্ছিত আছি। যখন মুহূর্ত তৈরি হয়, টের পাই কেমন এই রক্তমাংস তার অন্তস্থ বোধ। তার থেকে কতটা আলাদা আমি। এই আমি কতটা আলাদা রক্তমাংসের থেকে কতটুকু বিচ্ছিন্ন। যেভাবে নিত্য ঘুম ও জেগে ওঠা। জেগে ওঠার পিঠে আশ্চর্য ঘুম। পিচ্ছিল হয়ে থাকা। এই যখন অনুভব করতে যাব অনেক সচেতন হয়ে আছি, সজাগ আছি সেইসময় আলাদা হলাম। মুক্তি পেলাম। অসার হলাম। কথায় ফিরে এলাম। আমি যেখানে অবস্থান করে থাকি। সেরকম অবস্থান থেকে আলাদা সে-সব রক্তমাংস। এর ভেতর প্লুরাল সমস্ত কিছু। যেদিক দিয়ে তৈরি হতে গিয়ে আধখান হয়ে বিচ্যুত হওয়া। এর কাহিনি অনেকেই ভিন্ন। ভিন্নরকম একটা আয়না রাখা আছে। যেটাকে আয়না বললেও ভুল হয়, অথবা বিভ্রান্তি বলে মেনে নেওয়া চলে।

বৃত্তের ব্যাপারটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। বিকাশ একজন আবহমান মানুষ যে শুধু জীবনের গূঢ় অন্বেষণের প্রতীক নয় সঙ্গে একটি আন্দোলনের ইতিহাসও। একদিকে জীবনের টানা সুর শোনা যাচ্ছে। অন্য দিকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন টানা সুর। একটা দিন ছন্দপতনের। সেখানে নির্ভীক একাকিত্ব গোপন করে রাখা নিজেকে। নিজেরই গতিবিধির মধ্যে

খুঁজে চলা প্রতিটি ক্ষণ কখনো তা এসেছে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বা গভীর নির্জনতায় বিশুদ্ধ অনুভূতির ভেতর দিয়ে। এখানেও ইতিহাস চেতনা কাজ করেছে। একজন মানুষের অতিবাহিত জীবনকে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে ইতিহাসচেতনা কাজ করে এবং তা নির্ভর করে যিনি দেখছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। সরলরৈখিক হয়েও এর চেয়ে গভীর বহুরৈখিকতা কোথাও নেই। বিকাশ লোকাল ট্রেন থেকে নেমে গাছের নীচে বসে সারাদিন কাটিয়ে দিল আর একে একে সমস্ত মুহূর্ত এককভাবে গুটিয়ে এল নিরসন হল যেন। বিকাশের অনুভূতি হয়ে উঠল আমার অনুভূতি। কখনো সিনেমার রিল সামনের দিকে এগোতে এগোতে গুটিয়ে আসছে। স্থিরচিত্র কোনো এক সময়। তারই ভেতর মহৎ হয়ে ওঠা অনন্য জীবন সমগ্র তৃপ্তি-অতৃপ্তি কাটিয়ে উঠে নিরাসক্তি। একটি অস্তিত্বের হারিয়ে যাওয়ার ভেতর কি সমগ্রতা ফিরে পাওয়া না কি হারানোর ভেতর একেক সময় এত মহত্ত্ব থাকে, কেউ হারাতে চাইছেন কোনো সমাপ্তির জন্য। যুগের সমাপতন এরকমই হয় ধীরে। আস্তে করে এক রাত্রিযাপনের ভেতর সমাপতন ঘটে। বিকাশ অজানা গন্তব্যের লোকাল ট্রেনে উঠে এক অজানা স্টেশনে রাত কাটিয়ে সকালে পুনরায় গন্তব্যে ফিরে গেল। কিন্তু কেউ বিকাশকে দেখল না, কারণ, 'যে ফিরে এল সে বিকাশ নয়'। বিকাশ যার মাথার দাম পনেরো হাজার টাকা সে ছিল এক অন্য মানুষ। আর খুব সূক্ষ্মতর একটা হিউমার আছে গল্পে যেটা জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে নিবিড়ভাবে উদ্যাপিত করলে অনুভব করা যায়। গাঢ় হতে হতে এই হিউমার একটা সময় সিরিয়াস ইঙ্গিতবহুল হয়ে ওঠে। টেনে আনতে চেষ্টা করে অস্তিত্বের অনালোকিত বিচ্ছিন্ন কিছু বোধকে।

প্রতিদিন আমি অল্প অল্প করে অর্থহীনতায় ভরে উঠি। মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অর্থহীন ইঙ্গিতে ভরে উঠতে উঠতে যে-দিনটি আমার মোহভঙ্গ করে সেদিনটি হল 'সোমবার'। পীযূষ ভট্টাচার্যর নানা গল্পে বারেবারে রূপকথা ফিরে আসে। অনুষঙ্গহীনভাবে গড়ে ওঠে মানুষ আর মানুষই সে-সব রূপকথার অংশ হয়ে ওঠে। প্রতিটি রূপকথাই কোনো-না-কোনোভাবে নৃশংস হয়। রক্তাক্ত সন্ত্রাস গুপ্ত থাকে। যৌনতায় কখনো ভরপুর। কখনো তীব্র শ্লেষাত্মক হয়ে ওঠে বাতাস। এরকমই একটা গল্প 'রণক্ষেত্রে একা দ্রৌপদী'। যেখানে শারীরিক নির্যাতনের শিকার দেখানো

হয়েছে নানাবিধ সন্ত্রাস আর আক্রমণের মাধ্যমে। গল্পে দু-রকমের কীটের কথা বলা হয়েছে। শোষক পোকা ফসল খেয়ে নষ্ট করে। আর সুন্দরী পোকা শোষক পোকাকে খেয়ে ফ্যালে। এখানে সন্ত্রাস দেখানো হয়েছে আধিপত্য দেখানো হয়েছে। এক আধিপত্য আসে ক্ষুধা থেকে আরেকরকম আধিপত্যের ভেতর ক্ষুধা ও দমন দুটোই থাকে যেন সন্ত্রাসই সন্ত্রাসকে দমন করছে। এর তো রাজনৈতিক ব্যাখ্যা আমরা করতেই পারি। তীব্রভাবে যেটা গল্পকার দেখিয়েছেন সেটা হল ধর্ষণের সন্ত্রাস। একজন মেয়েকে ধর্ষণ করে তার পায়ুদ্বার আর যোনিদ্বার এক করে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে ক্রমাগত মূত্রগন্ধ। এই সন্ত্রাসের উৎপত্তি ভালোবাসা থেকে যেটা একরকমের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে উঠে এসেছে। ভালোবাসার ভেতরে জন্মানো সন্ত্রাস। তারপর সেই ধর্ষিতা নারী তার মূত্রগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে এক রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে নিজেকে সন্ত্রাসের অংশ করে তুলছেন। প্রতিশোধ নিতে নামছেন। সামাজিক অবস্থাকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। এই গল্পটি অত্যন্ত শারীরিক গল্প। আধিপত্যের গল্প। শরীরের সঙ্গে শরীর জুড়ে যাওয়ার গল্প। একের পর এক যখন মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয়ে চলে দিনের পর দিন তখন মেয়েরাই নিজের হাতে সন্ত্রাসের ভয়ের দণ্ড তুলে নেয়। গল্পের মধ্যে একটা তীব্র অপেক্ষা আছে, নিঃসঙ্গতা আছে, ভালোবাসা থেকে জন্মানো সামাজের মনে সন্ত্রাস আছে যেখান থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ নেই, আছে কেবল রক্তমাংস আর কেবলই রক্ত।

৩

আমাদের ভেতরটা এতটাই শূন্য যে, সেখান থেকে দমকে দমকে বিপুল এক আর্তনাদ বের হতে থাকে এবং সেটা খুব কম সময়ের জন্য ক্ষণস্থায়ী। প্রথমবারের আর্তনাদ টের পেলে দ্বিতীয়বারের সময় শূন্যতার ভীতি এত বেশি চেপে বসে তার ফলে পূর্ণ করবার তাগিদ অতি প্রবল হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নিঃসঙ্গতা। পীযূষ ভট্টাচার্যর আরেকটি গল্প 'আর্তনাদের উদারা-মুদারা-তারা'— এরই অনুষঙ্গে এত টানা কথা বলতে হল যাতে আর্তনাদের সুর ও সন্ত্রাস দুটোই টের পেতে পারেন আপনারা। এখানে গল্প আছে, কথাস্রোত আছে। কাহিনির মায়া আছে। জীবনের বিপুলতাও কি কম আছে। সে-সব কথার চেয়ে এখানে আর্তনাদের প্রতি আর্তি এতটাই বেশি যে,

গল্পের কথকের মধ্যে বিরাজমান অন্ধকার প্রবল শূন্যতা হয়ে ফিরে আসছে বারবার। প্রতিটি ক্ষণকে এখানে আমি আমার নিজের দেখা থেকে খণ্ডিত করে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তার রসায়নে ডুবিয়ে দেখতে পারি যার থেকে গড়ে ওঠা প্রতিটি খানাখন্দ হয়ে উঠবে সেই তীব্র আর্তনাদের প্রতীক। এখানেও রূপকথার আদল আছে। তবে লোককথার বিনির্মাণ বেশি। মিথনির্ভর অনেক জায়গা আছে যাকে হয়তো সরাসরিভাবে ছুঁতে না পারলেও বিপুল এক অন্ধকার সামনে উঠে আসবে। যেমন: 'সেই বচ্ছরি চাচির আর আমার বে।' আরও: 'ছয়মাসের স্বামী নিয়া এখন কী করুমরে', 'ছ'মাসের শিশু স্বামীকে যুবতী স্ত্রী কী করে?' শরণার্থীদের কথা বলা হয়েছে এখানে। নোংরার স্তূপে জ্যোৎস্না মাখা বসবাস যাদের। তাদের মধ্যেই কি কেউ সেই ভিক্ষা করতে আসে? এই প্রসঙ্গ ধোঁয়াটে হয়ে আছে। বিপুল রাতের ভেতর লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্ধকারে আক্রান্ত। এখানে সমাজের উঁচু ও নীচু স্তরের স্তরীকরণ দেখানো হয়েছে। যার মধ্যে নিঃসঙ্গতায় জর্জরিত একজন মানুষ নিজের বেঁচে থাকার বিলাস খুঁজে পাচ্ছে একজন ভিক্ষুকের ডাকের ভেতর। এই গল্পের অনেকটা জুড়ে মেটাফিকাল ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছি। অনেকটা আবার নিত্যদিনের বেঁচে থাকার ভেতর থেকে নিজেকে কল্পনায় তৃষিত করার পর যেরকম কল্পনার দৃশ্যবিভ্রম ভেসে ওঠে তারই কিছু ইঙ্গিত আমি এখানে পেয়েছি। 'অবশ্য নমিতা রাতের নিঃসঙ্গতা কাটাতে সবচেয়ে পুরনো ইংরেজি থেকে ইংরেজি তা থেকে বাংলা ডিকসেনারিটা কপি করতে শুরু করে দেয়। যার পৃষ্ঠাগুলো এতই পুরনো যে কাগজ তার বর্ণ হারিয়ে অবর্ণনীয় এক রঙা। এই কাগজ তৈরির সময় যে সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হয়েছিল সেই সব মৌলিক উপাদান থেকে এক ধরনের গন্ধ উঠে আসত। পৃষ্ঠা ওলটানোই ছিল এক জটিল সমস্যা। এতটাই সাবধানতা অবলম্বন করতে হত যার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে নিজেকে বাতাসের চেয়ে হালকা করে নিয়ে নির্ভার আঙুলের ডগার ব্যবহারের মাধ্যমেই ওলটাতে হবে নচেৎ সবকিছু ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে। আর নমিতা এই রকম ভঙ্গুর কাগজ নিয়ে কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত একসময়।' আরেক দিক থেকে ভাবতে গেলে গল্পটি দাম্পত্যের গল্পও। নমিতা ও গল্পের কথক দু-জনেই এতটাই নিঃসঙ্গ যে, তাদের নৈঃসঙ্গকে ফুটিয়ে তোলার জন্যও হয়তো গল্পকারের আর্তনাদের প্রয়োজন হয়েছে। এই আর্তনাদ

শেষের দিকে এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, কমলেশবাবুকে ফোন করে কথক সেই আর্তনাদ শুনতে চেয়েছে। নৈঃসঙ্গ নিঃসৃত ফসল তার অন্বেষা ঘুর পথে অতিক্রমণ। তারপর নমিতার কাছেই শুনতে চাওয়া সেই আর্তনাদ। ফোন করে সে নমিতার জীবনের আর্তনাদ শুনে চলেছে। সেই মুহূর্তটাই আমার ক্রসিয়াল মনে হয়েছে। তারপর নমিতা আর কথকের দাম্পত্যের আর্তনাদ একীভূত হয়েছে। স্রোতে ফেরার স্বাভাবিক মাধুকরী। একটা জায়গা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। একজন জীবিত মানুষ, নমিতা যে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে সেটা দেখানো হয়েছে তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশের তলায় নাম ছাপা হয়েছে সেইটুকু সৌজন্যের মধ্য দিয়ে। ভুল হয়ে যায় সবকিছু। এতই কুহক জীবনকে ছেয়ে থাকে আমাদের যে, তাকে সরাতেই যেন গল্পকার এই গল্পটি রচনা করছেন।

পীযূষ ভট্টাচার্যর গল্পের ন্যারেটিভে কবিতার এসেন্স থাকলেও তা কখনোই কবিতা হয়ে ওঠে না। এটা আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করেছে। প্রতিটি ছত্রে কাহিনির এত অবিরাম স্রোত যেন একজন গল্পকারের গল্পবিশ্বে কোনো ক্লান্তি নেই। অদ্ভুত জীবনীশক্তি ধারণ করে চরিত্ররা। একই ইঙ্গিতের একাধিক প্রয়োগ নেই বললেই চলে। প্রতিটি গল্পই নির্দিষ্ট কোনো মহৎ দর্শনকে নির্ভর করে গড়ে উঠলেও এর ভেতর যে-রূপকথা বা লোককথার জীবন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার সাথে জড়িয়ে তীব্র শক্তির জীবন। এতই প্রাণবন্ত যে, তার কখনোই ক্ষয় নেই। এর পেছনে সুপ্ত আছে গভীর থেকে
গভীরতর ইতিহাস-চেতনা ও শরীরবোধ। প্রতিটি বিষয়ই যেন কাহিনির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেলে আর কিছু করার থাকেনা, তখন কাহিনিগুলোই চলমান এগিয়ে নিয়ে চলে রক্তমাংসকে।

৪

বার্গম্যানের 'সেভেন্থ সীল' চলচ্চিত্রে মৃত্যু যখন নাইটকে প্রশ্ন করে, 'তুমি কি প্রস্তুত?' এর উত্তরে নাইট বলছে, 'আমার শরীর প্রস্তুত কিন্তু আত্মা নয়'। এরকম স্ববিরোধিতা আজীবন বহন করতে হয়। নাইট আরও কিছু সময় চেয়ে নিচ্ছে মৃত্যুর কাছে, সে জ্ঞানলাভ করতে চায়, ঈশ্বর কী— জানতে চায়,

তার জন্য মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে। শাদাটে ফ্যাকাশে মুখের মৃত্যু। অদ্ভুত দীপ্ত চোখ। রহস্যময়। 'পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষটি' একটি গল্প— পড়ছি আর পড়ে চলেছি একটা ক্ষণ পর পেরিয়ে যায়। শেষ যে হল তার স্মৃতি বড়ো ভাবাচ্ছে। শেষ হওয়ার পর পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ আমি। আমি অনুভূতিটার সঙ্গে সময় কাটাতে চাই। মানুষ কেমনভাবে পাথরে পরিণত হয়েছে তার সাথে যুক্ত অভিশাপ আর শিশুর কান্নার ইতিহাস জড়িয়ে থাকে তার রূপকথার রেশ। আমি রেশটার সঙ্গে হাঁটতে থাকি, কাহিনি আমার কাছে সেকেন্ডারি। রণ পা। রণ পা লাগিয়ে মানুষটা পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ। বিজ্ঞাপিত হয় সে। এখানেও বিশ্বাস অবিশ্বাসের খেলা চলে। বিজ্ঞাপিত হওয়ার ভাষা। আমি এখুনি মরে গেলে অনুভূতি নিতে সক্ষম থাকব না। 'সেভেন্থ্ সীল' চলচ্চিত্রের নাইট সমাজের নানা স্তর পর্যবেক্ষণ করল, বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভেতর দিয়ে গিয়ে সে যখন গৃহে ফিরে যাচ্ছে। তখন সেভেন্থ্ সীলের মিথটি উন্মোচিত হচ্ছে: 'When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for half an hour'। ঝড় উঠেছে। তখনই মৃত্যু এসে তাদের নিয়ে যাচ্ছে টানতে টানতে তারা মৃত্যুর গান গাইছে। ন্যারেটিভের সেই লম্বা মানুষটি কীভাবে রণ পা থেকে নামছেন। সহজাত। শরীরী ভঙ্গিমা মোহভঙ্গ করছে গল্পে। গ্রামীণ মিথ উজাগর হচ্ছে। বটগাছ আসলে মা। তার ঝুরি হল বোন। গল্প শেষ হওয়ার পরও শেষ হয়নি। সেভেন্থ্ সীলও শেষ হয়নি যেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় যেন। সমস্ত কিছুকে একদিকে রেখে ন্যারেটিভের শেষ হওয়ার বোধটুকু আমাকে ভাবাচ্ছে। আমি যেন পৃথিবীর সেই লম্বা মানুষটি। সবচেয়ে লম্বা।

যত দিন যায় অনুভূতি প্রবল হতে থাকে। ইশারা ইঙ্গিতগুলো দৃঢ় হয়। স্মৃতির ভেতর কোথায় যেন মূল ঘটনাটা মুছে গিয়ে কেবল শূন্যে বিন্দুর মতো জেগে থাকে। পীযূষ ভট্টাচার্যর লেখার এই বোধটুকু নিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে। সমস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সময়ের মধ্যে যে-ব্যবধান আছে সেটাও মুছে গিয়ে কেবল বিন্দু। অবয়ব শুধু। ইশারার জগৎ। ভাষার মধু আছে ভরপুর। যাকে তুমি ছুঁতে চাইছ তাকে কোনোদিন অবয়বে পাবে না। শুধু মনোরম বোধ। কথাগুলো। সবই আফটারম্যাথ। মুহূর্তে কিছু না। অতীত-বর্তমানের মধ্যে কথোপকথন চলে। 'তালপাতার ঠাকুমা' উপন্যাসের 'তীর্থযাত্রার পথে

কিছু লিলিপুট' অংশ থেকে একটু পড়ে দেখা যাক: 'এ যেন কোনো নিরুদ্দেশির লাশকে সনাক্তকরণের মতো কঠিন। চেহারার বর্ণনা স্মৃতি থেকে লোপাট। কেবলমাত্র সময়ের ব্যবধানের হিসেব করে লাশের সনাক্তকরণের মধ্যে একটা জীবন চষে ফেলা থাকে।... শূন্যে বিন্দুর মন স্থির পাখির বাসার সামনে দাঁড়িয়ে কল্পনাকে কতদূর পর্যন্ত ছুটিয়ে নেওয়া যেতে পারে?'।

অনুভূতি যখন মাত্রাতিরিক্ত প্রবল হতে থাকে ঠিক সেই মুহূর্তে লেখক পীযূষ নানারকম কল্পনার অবলম্বন করেন। কাহিনি তখন তার সীমাবদ্ধতা ত্যাগ করে এগিয়ে যায় রূপকথার ভেতর যাকে আমি রূপকথা বলব না। রূপকথা এখানে অন্য অর্থে যেখানে বাস্তবকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য এমন এক পরিপূরক প্রয়োজন হয়ে ওঠে যে, সেখানে পরতের পর পরত শুধু অনুভূতি সঞ্চারিত হতে থাকে। আর এ-ধরনের অনুভূতিকে ধারণ করতে পারে একমাত্র অলটারনেট রিয়ালিটি। যাকে প্রকারান্তরে বাস্তব বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা হওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এ-দিক থেকে কথাসাহিত্যের ন্যারেশনও অনেক অনেক বদলে যায় এবং তারই অনুমান আমরা পীযূষ ভট্টাচার্যর লিখনভঙ্গিমা থেকে বুঝতে পারি। 'তালপাতার ঠাকুমা' থেকেই একটু পড়ে দেখা যাক: 'জলের নিম্নগামী স্নিগ্ধতাকে মুছে ফেলবার জন্য চরম হিংস্রতার আশ্রয়ে কেউ কেউ চলে যায়। জলকেও দগ্ধ হতে হয় মানুষ বা দেবতার দ্বারা। এসব কথা তার কথার মধ্যে ছিল না, পরিবর্তে ছিল শিবসা নদীর কথা। যার শেষ প্রান্তে সাত-সাতটি নদী মিশে তৈরি সাতমুখী আগুনজ্বালা। তবে কি নদী নিজেকে নিজেই দগ্ধ করে? সেখানে সে নাকি একটি ভীতির সংকেত সূচক নিশান রেখে এসেছে যা বাতাসে উড়ে সাবধান করে দেয় মানুষকে।' এখানে আরেকটা মোক্ষম লক্ষণীয় হল এই লেখার অন্তর্গত দার্শনিকতা এবং বাইরের ভাষাগত প্রয়োগে যেভাবে প্রশ্ন উঠে এসেছে সেখানে দার্শনিক প্রশ্ন ফিরে ফিরে বিদ্ধ করে পাঠককে। সেই পাঠক তখন নিজে একজন লেখক হয়ে ওঠে। লেখক এখানে অনেকটাই পাঠকের ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন যে, তিনি কীভাবে সেটাকে ডিল করবেন। তাঁর গল্পেও এরকম অনেক দার্শনিকতা ও বাস্তব রূপকথার ব্যবহার পাই কিন্তু সেখানে অনেকক্ষেত্রে ব্যবহার অনেকটাই নরম—

বহিরঙ্গের আবরণ হিসেবে দেখা দেয়।

অনুভূতির আগুন তো আছেই তার সঙ্গে ভারতীয়ত্ব। আজীবন লেখকের মধ্যে বিরাজ করেছে অপরিসীম ভারতীয় আবেদন। নানা জায়গার লোককথা-রূপকথাকে অদ্ভুতভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন গল্পে। প্রতিটি গল্পের ভাষা এবং চিন্তাশৈলি এমন তীব্র এক আবেগের সঞ্চার করে যে, তা হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধ এক স্বর। 'কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের পিঠে' বইয়ের একটি গল্প 'পাইন অ্যাপেল ফ্লেবার'-এর উল্লেখ করতে হয়। গল্পটা পড়তে পড়তে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। লোককথা কখন যে বাস্তব আর কল্পনার জাল বিস্তার করে এক অদ্ভুত জগৎ গড়ে তোলে তার বোধ আলাদা করা যায় না। যেন অপরিসীম জীবন বয়ে চলেছে। মদের ভেতর দিয়ে মাদক একখানা গল্প। মদ বিক্রি নিয়ে একটা গল্পও যে মায়াময় হতে পারে তা এই গল্পটি পড়লে বোঝা যায়। আগেও বলেছি লোককথা প্যারালালি চলতে থাকে মূল কাহিনির সঙ্গে আর তার সঙ্গে সাযুজ্য রাখে ন্যারেশন। ন্যারেশনে যে-সূক্ষ্মতা লক্ষ করি তার ভেতর কোনোভাবেই লেখকের ব্যক্তিগত স্বগতোক্তি খুব একটা প্রভাব ফ্যালে না। ধীরে ধীরে কাহিনি এগোতে থাকে বাস্তবকে সঙ্গে করে এবং এই সমস্ত বাস্তবকেই অতিক্রম করে লোককথার ক্রম। এই গল্পটার মধ্যেও সন্ত্রাস আছে। গল্পের কথকের 'স্ত্রীর চোখ দুটো ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে উপড়ে নিয়ে গেছে'— এরকমই জানতে পারি গল্পের শেষ দিকে। লোককথার ঘটনায় যেভাবে 'এদের প্রথম চেষ্টাই ছিল অগ্নিকুণ্ড রচনা করে লাবণ্যপ্রভার সমস্ত দৃষ্টিপথকে ঝলসে দেওয়া।'— এমনভাবেই কথকের স্ত্রীর চোখ উপড়ে নেওয়া দেখানো হয়েছে। লোককথা আর বাস্তবের কোথাও একটা সংযোগ ঘটানো হয়েছে। লাবণ্যপ্রভার গল্পটি একটু বলি। সন্ধ্যা হলেই ছাদে উঠে লাবণ্যপ্রভা নামে একজন মহিলা 'চক্ষুর পলক' না ফেলে একদৃষ্টিতে আনারস বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকত... আনারস বাগানের জিয়তকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকত। যেখানে ডুব দিয়ে মৃত যুবক নিশ্চয় প্রাণ ফিরে পেত। একে প্রেম সম্পর্কিত কিছু বলে রটনা করা হয়েছিল। সেই জন্য তান্ত্রিক ডেকে লাবণ্যপ্রভার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। তান্ত্রিক আবার লাবণ্যপ্রভার শরীরের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এরকম কিছু ঘটনা কথিত আছে গল্পে। লোকে বিশ্বাস করে কেচ্ছাও কখনো কখনো সত্য হয় এবং সত্য হয়ে বাস্তবকে কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এবং এই গল্পে সেটা দেখিয়েছেন গল্পকার। এর ভেতর চূড়ান্ত সন্ত্রাস আছে। বাস্তবের সন্ত্রাস যে কখনো কখনো লোককথা মিথ হয়ে ওঠে, আমাদের কাছে ধরা দেয় ইঙ্গিতবহুল কাহিনি হয়ে। যে-লোককথার উল্লেখ এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেটা হল জিয়তকুণ্ডকে ঘিরে: 'পরশুরামের সৈন্যরা যুদ্ধে নিহত হইলে এই জিয়তকুণ্ডে নিক্ষেপ করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পুনরায় পুনর্জীবিত হইত। কিন্তু দরবেশ এই গোপন রহস্য জানিয়া ফেলিয়া পক্ষির সাহায্যে একটুকরো গোমাংস অসমান থিকা কুণ্ডের পানিতে নিক্ষেপ করার ফলে সৈন্যরা পুনর্জীবিত হইত না। কিন্তু মৃত সৈন্যদের পিরিতের কথা জানিতে দরবেশের ইচ্ছায় কেবল সন্ধ্যাকালে সেই সব মৃত সৈন্যরা পিরিত করিবার জন্য জীবিত হইত।' এই গল্পে আনারসের চক্ষু বা চোখকে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। যেন আধিভৌতিক। গল্পের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই গল্পকারের এই প্রয়োগ। আর আনারসের চোখের জায়গাগুলো পড়তে খুব আন্তরিক মনে হয়েছে। যেন সেই লাইনগুলো বারবার ফিরে পড়ার মতো। পীযূষ ভট্টাচার্যর অধিকাংশ লেখাতেই দর্শনের মধু ও ভাষার মধু থাকে যেটা আগেও উল্লেখ করেছি।

গত বছর থেকে পীযূষ ভট্টাচার্যর এই গল্পের বইটি পড়া শুরু করেছি। লেখক স্বয়ং আমাকে দিয়েছেন। প্রথম গল্প 'সান্ধ্যচ্ছটা' পড়া শুরু করি বাসে। বালুরঘাট থেকে মালদা ফিরতে ফিরতে গল্পটা পড়ে শেষ করি। জীবনের অনেকটা সময় শূন্যতা নিয়ে ভেবে কাটিয়েছি। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। কিছু অনুভূতি থাকে বলে বোঝানো যায় না। সে-সবের ভেতর বিরাজ করে গভীর আর্তনাদ ও মৃত্যু। মৃত্যুবোধ। এর চেয়ে আর কিছু না। সান্ধ্যচ্ছটা হল আমাদের জীবনের সেই ক্ষণ যখন শুধুমাত্র সেই ক্ষণটুকু বুঝিয়ে দেয় সমগ্রের সারসংক্ষেপ। গোটা জীবন একটি ক্ষণের মধ্যে গুটিয়ে আসে। আর সেরকম ভাঁজ হয়ে যাওয়া সময় অনেকটা এই বইয়েরই 'ইসরাইলি হলুদ খঞ্জন' গল্পটির 'বড়োসড়ো একটা শামুক'-এর মতো— তার

গতিপ্রকৃতি সেই শামুকটি একটি পাখিকে পা সমেত নিজের ভেতর গুটিয়ে নিতে পারে, ফাঁদ সৃষ্টি করে। গুটিয়ে ভাঁজ হওয়ার প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম গল্পটি। সান্ধ্যচ্ছটায় ফিরে আসি। সেই মুহূর্তে আকাশ আর নীলগিরি পাহাড়ের গতিপ্রকৃতি যে মানুষকে কীভাবে গভীর জীবনবোধের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে সম্মুখীন করতে পারে তা আমরা 'সান্ধ্যচ্ছটা' গল্পটি পড়লে অনুভব করতে পারি। এর মধ্যে সুপ্ত আছে মৃত্যুর বোধ। আত্মহননের তৃষ্ণাও এখানে তুমুল। আত্মসম্মানবোধও বহুল পরিমাণে কাজ করে এখানে। মানুষ কীরকমভাবে শরীরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথার ভেতরে গড়ে তোলে যেরকম জীবন। এইসব গল্প অনেকটা আয়নার কাছাকাছি। বাক্য গড়ে ওঠার সঙ্গে যেভাবে শরীরে অনুরণন ওঠে। আমরা টের পাই অলৌকিক উষ্ণতা শক্তি যার উৎস আমাদের স্মৃতির মধ্যে লুকিয়ে আছে যার থেকে কোনো নিস্তার নেই— অভিজ্ঞতা ভেঙেচুরে দেখিয়ে দেয় আমাদের যে, কীভাবে আচরণ করতে হবে কখন সময়কে ধীরে করে দেখে নিতে হবে অণুবীক্ষণে। কতটা সান্ধ্যচ্ছটা প্রয়োজন। কখন সব কোলাহল ছেড়ে নীলগিরিতে বসবাস করা প্রয়োজন। এখানে কোনো সঠিক কারণ নেই। গল্পে হামিংবার্ডের প্রসঙ্গটা যেমন জীবনের অসীম স্ফুরণকে বোঝানোর জন্য এনেছেন গল্পকার যার নিয়তি হল মৃত্যু। এই একই দর্শন আমরা তাঁর উপন্যাস 'তালপাতার ঠাকুমা'-তেও পেয়ে থাকি তবে বৃহৎ পরিসরে। যেন জীবন খুলে আসে।

সেরকমই তাঁর গল্প। জীবন খুলে আসে। সহজ কিছু না। আমাদের ধীর লয়ে চলা শিল্পসময়ের কোনো পার্থিব ব্যাখ্যা হয় না। ক্রমাগত ব্যক্তিগত। যত দিন যায় ততই আরও বিভিন্ন যেন। অচেনা দ্যাখায় ঘরবাড়ি। সংসার তার ফলনশীলতা ছেড়ে উধাও হয়। আমরা সান্ধ্যচ্ছটা খুঁজি।